BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link: 10.70798/Bijmrd/02040003

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 4| May 2024| e-ISSN: 2584-1890

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমকালীন বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি

নমিতা মাইতি

Research Scholar, Department of Bengali,

RKDF University, Ranchi

ভূমিকা:

বাঙালির জীবনের আনন্দ-বেদনাকে সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভাষায় যে কথাশিল্পী পরম সহানুভূতি ভরে তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যে, তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলি জেলার ছোট্ট গ্রাম দেবানন্দপুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র।দারিদ্র্যের কারণে তাঁর শৈশবকাল বলতে গেলে মাতুলালয় ভাগলপুরেই কেটেছে।দারিদ্র্যের কারণে ফি দিতে না পেরে বেশ কয়েকবার স্কুল বদলিও করতে হয়েছিলো ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত ও মেধাবী শরৎচন্দ্রের।এন্ট্রান্স পাস করে কলেজে ভর্তি হলেও এফএ পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পেরে পরীক্ষায় বসতে পারেননি। দারিদ্র্য যখন শিক্ষাজীবনে অব্যহতি টানলো, তারপরই শুরু হলো আপাত সাধারণ এই মানুষটির বর্ণাঢ্য কর্ম ও সাহিত্যজীবন।এ সময় প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টের বাড়িতে আয়োজিত সাহিত্যসভায় লেখালেখির অনুপ্রেরণা ফিরে পেলেন যেন আবার।যার ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্য পেয়েছিলো বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা'র মতো কালোত্তীর্ণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর উপন্যাস সমগ্র। কাছাকাছি সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অনুপমার প্রেম, আলো ও ছায়া, হরিচরণ, বোঝা ইত্যাদি রচিত হয়।বনেলী রাজ স্টেটে সেটলমেন্ট অফিসারের সহকারী হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন এসময়। কিন্তু তারপরই বাবার উপর অভিমান করে সন্ন্যাসদলে যোগ দিয়ে গান ও নাটকে অভিনয়ে মনোনিবেশ করেন।কখনও কলকাতা হাইকোর্টের অনুবাদক, আবার বার্মা রেলওয়ের হিসাব দপ্তরের কেরানি হিসেবেও কাজ করেন শরৎচন্দ্র।রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে, এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে।এর মাঝে নিরন্তর চলেছে নিজস্ব জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতা উৎসারিত সাহিত্যচর্চা।সমষ্টি আকারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্প সমগ্র বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য, শ্রীকান্ত-৪ খন্ড, কাশীনাথ, ছেলেবেলার গল্প ইত্যাদি সময় নিয়ে প্রকাশিত হলেও পেয়েছিলো দারুণ পাঠকপ্রিয়তা।শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বই সমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এবং বিশ্বব্যাপী পাঠকের কাছে হয়েছে সমাদৃত।শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বই সমগ্র দেবদাস, শ্রীকান্ত, রামের সুমতি, দেনা-পাওনা, বিরাজবৌ ইত্যাদি থেকে বাংলাসহ ভারতীয় নানা ভাষায় নির্মিত হয়েছে অসাধারণ সফল সব চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র।সাহিত্যকর্মে অসাধারণ

অবদানের জন্য এই খ্যাতিমান বাংলা সাহিত্যিক কুন্তলীন পুরস্কার, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের সূচীপত্রে শরৎচন্দ্র সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক, এ সত্য ইতিহাসসিদ্ধ। তাঁর এই জনপ্রিয়তার সম্ভাব্য কারণসমূহ এক নয়,একাধিক।সেইগুলিকে সূত্রাকারে এইভাবে নির্দেশ করা যায়:-

(১) শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসকিংবাগল্পকোন সামাজিক সমস্যা জড়িত।সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের প্রকাশ, সামাজিক প্রথা ও অভাবের চাপে ব্যক্তিমনের যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তাঁর উপন্যাসের ভাবসত্য রূপায়িত।

(২) গ্রাম-বাংলার ও মফস্বলের পারিবারিক জীবন, তার ঘরোয়া জীবনের খুঁটি-নাটি শরৎ-সাহিত্যে অভিব্যক্ত। এই পরিবার জীবনের একদিকে আছে স্নেহ-বাৎসল্য, অন্যদিকে প্রণয় মাধুর্য। এই দুই ভাবের মূল অবলম্বন নারী ও তার পরিবার-চিত্র হয়েছে রঙে রসে মূর্ত।

(৩) পরিচিত সাধারণ নরনারীর জীবনের ছবি এখানে স্বপ্রকাশ। চরিত্রগুলি মনন অপেক্ষা মনের দ্বারা অধিক পরিচালিত। স্বভাবতই এখানে আবেগ এবং হৃদয়-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ বেশি।

(৪) শরৎ-সাহিত্য প্রধানত নারী মনের প্রতিচ্ছবি ব'লে কথিত।উপন্যাসের কাহিনীতে তুলনামূলকভাবে পুরুষ অপেক্ষা নারী-প্রাধান্যই বেশি।পুরুষ এখানে উদাসীন, নিষ্ক্রিয় ও ভাবুক প্রকৃতির। অথচ নারীর বিচিত্ররূপ এখানে সহনশীলা (অন্নদা দিদি), সেবাপরায়ণা (সাবিত্রী), স্বৈরিণী (কিরণময়ী), প্রেমিকা (রাজলক্ষ্মী), প্রতিবাদ-মুখরা (অভয়া, কমল) ইত্যাদি নানা স্বভাবপ্রকৃতিতে পরিপূর্ণা। কেবল তাই নয় সামাজিক আঘাত এবং সংস্কারের নিষেধ—এই দ্বৈত চিন্তার টানাপোড়েনে নারী-মনস্তত্ত্ব শরৎ-উপন্যাসে অদ্বিতীয় ভাষারূপ পেয়েছে।

(৫) সমকালের সমাজজীবনের অত্যাচারী জমিদার গোষ্ঠীর শোষণচিত্র, দরিদ্র মানুষের অসহায় অবস্থার জ্বালা, সামাজিক ভেদবিচারের ফলে তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি উপেক্ষা অবজ্ঞা-গ্লানির বাস্তব পরিচয় শরৎ সাহিত্যে উপস্থিত।

(৬) পাঠকমনকে আদ্যন্ত আবিষ্ট করে রাখার মত কথনশক্তি ছিল এই কথাশিল্পীর করায়ত্ত। কাহিনী পরিবেশনের যোগ্য কথাশিল্পের কলাকৌশল, কথন বয়নের নিপুণতা, চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য, মনোজগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শরৎ-সাহিত্যকে কালজয়ী হতে সাহায্য করেছে।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়:- (ক) মধ্যবিত্তশ্রেণীর পারিবারিক জীবনচিত্র, (খ) সমাজ-সমালোচনা, সমাজ-বহির্ভূত নিষিদ্ধ প্রেম, তর্ক-বিতর্ক, মতবাদ-সংঘর্ষ।

প্রথমটিতে আছে প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেমের সম্পর্ক, তার দৈন্য-দুর্দশা, একান্নবর্তী পরিবারের নানা বিপর্যয়, মা অপেক্ষা কাকীমা অথবা মাতৃসমা বৌদির ছোট দেওরের প্রতি বাৎসল্য, প্রবৃত্তির বিরোধ ইত্যাদি পারিবারিক বিষয়ের উপস্থাপনা।অন্যটিতে আছে দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যা, নারীত্বের মূল্যায়ন, নিষিদ্ধ প্রেম, সতীত্বের মানদণ্ড নির্ধারণ, সমাজজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, উচ্চবর্ণের হাতে সামাজিক নিপীড়নের ভেদাভেদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের প্রতিবাদ বা অসহায় আর্তনাদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের প্রাধান্য।

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, যারা উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, একেই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের হয়ে নালিশ জানাতে"— আপন সারস্বত সাধনা সম্পর্কে মনস্পতি শরৎচন্দ্রের এই সত্যোচ্চারণের সার্থকতম প্রকাশ তাঁর উপন্যাস এবং গল্পগুলির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোট গল্প: এক সামাজিক দলিল

শরৎচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়ের একটি ট্র্যাজিক গল্প হলো 'মহেশ'।কাশীপুর নামক এক গ্রামে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে গরিব কৃষক গফুর মিয়ার বাস। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিন হলেও আসলে কিন্তু তারা চারজন। গফুর মিয়ার আদর-মমতা দিয়ে পোষা এক অবলা ষাঁড়ই সে চারজনের জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। প্রাণীটি ষাঁড় হলেও গরিব কৃষক গফুর মিয়া কোনোদিনও নিরীহ প্রাণীটিকে ষাঁড় হিসেবে দেখে না। সে ষাঁড়টিকে নিজের পুত্র হিসেবে জানে, আদর করে তার নাম রেখেছে 'মহেশ'।গ্রীষ্মের তপ্ত রোদ্দুরে যখন ফসলের মাঠ-ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়, বর্গা চাষ করে পাওয়া খড়টুকুও যখন আগের বছরের বকেয়া এই অজুহাতে জমিদার মশায় কেড়ে নিলেন, তখন বর্গাচাষী গফুর মিয়ার অভাবের সংসারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলানো কৃষক গফুর মিয়া যেখানে ঠিকমতো রোজ দু'বেলা আহার করতে পারে না সেখানে 'মহেশ' নামক ষাঁড়টির খাবার যোগাড় করা রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দিনদিন খেতে না পেয়ে ক্ষুধার্ত 'মহেশ' খাবারের সন্ধানে একদিন দড়ি ছিঁড়ে পলায়ন করলেও পরেরদিন ঠিকই ফিরে আসে একই জায়গায়।আদর যত্ন দিয়ে বড় করা মহেশকে এরই মধ্যে দরিদ্র কৃষক একবার বিক্রি করতে চেয়েও বিক্রি করতে পারে না। জৈষ্ঠ্য মাসের শেষে একদিন ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্ত-শ্রান্ত কৃষক গফুর মিয়া জানতে পারে তার প্রিয় মহেশ দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে গায়ের জমিদার বাবুর অনিষ্ট করে ছেড়েছে। এর মধ্যে আবার ওই উত্তপ্ত দুপুরে গফুরের একমাত্র মেয়েকে জলের পাত্র সমেত শিং দিয়ে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে দিল মহেশ। মেয়েকে এভাবে দেখতে পেয়ে রাগে ক্রোধে মেরামত করার জন্য রাখা ভাঙা লাঙ্গলটি হাতে নিয়ে গফুর মিয়া সজোরে আঘাত করে মহেশের মাথার উপর। মুহূর্তেই অবলা প্রাণীটিমাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং মাথা ফেটে রক্ত বের হতে হতে একসময় মারা যায়। মহেশের মৃত্যুর খবর শুনে গ্রামের মুচির দল তার মাংসের স্বাদ নেওয়ার জন্য চলে আসে।অপরদিকে গ্রামের হিন্দু জমিদার বাবু মহেশকে মারার শাস্তি দিতে লোক পাঠায়। কিন্তু ওই দিন রাতে, 'গফুর কহিল, দেরি করিস নে মা, চল্ অনেক পথ হাঁটতে হবে। আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতে ছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ও তে আমার মহেশের প্রায়চিত্তির হবে।' এই বলে গফুর অন্ধকার নিশীথে নিজের গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।শব্দশৈলীর চমৎকার গাঁথুনি আর বাক্যের দারুণ বিন্যাসে গল্পটিতে ফুটে উঠে এক অবলা জীবের প্রতি গরিব কৃষকের অকৃত্রিম ভালোবাসা। অপরদিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজের এক শ্রেণির জমিদারের হাতে গরিব কৃষকদের শোষিত হওয়ার করুণ চিত্র। এভাবে পাঠকের হৃদয়ে অশ্রুর কড়া নেড়ে সমাপ্ত হয় মহেশ গল্পটি।

তাঁর'ছেলেধরা' গল্পের বিষয়বস্তু হলো, সারা দেশে রটে গেল যে ছেলেদের বলি দেওয়া ছাড়া কোনভাবে রূপনারায়ণ নামক একটি খালের ওপর পুল তৈরি করা যাচ্ছে না। অপরদিকে একটি গ্রামে বাস করা মুখুজ্যে দম্পতি সব সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে রেখে একমাত্র ভাইপো হীরুকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিলেন। হীরু তার প্রাপ্য সম্পত্তি ফিরে পেতে এবং মুখুজ্যে দম্পতিকে শাসানোর পরিকল্পনা করে, একসময় রাইপুর নামক গ্রামের দুই পলোয়ান ভাই

লতিফ ও মামুদের সঙ্গে দুই টাকা দিয়ে চুক্তি করে।একদিন একাদশীর সময় লতিফ আর মামুদ ছদ্মবেশে মুখুজ্যে দম্পতির বাসায় প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে পুরো পাড়ায় রটে যায় ছেলেধরা এসেছে। তখন সারা গ্রাম থেকে লোকজন হৈহল্লা করে লাঠিসোটা নিয়ে এসে লতিফকে ধরে ফেললে মামুদ পালিয় যায়। তখন লেখক নিজেই, 'লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম মিঞা, ব্যাপারটা সত্যি কী বল তো? এখন অভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলো। মুখুজ্যে দম্পত্তির উপর কারও সহানুভূতি ছিল না, শুনে অনেকের করুণাও হলো। বললুম, লতিফ বাড়ি যাও, আর কখনও এসব কাজে এসো না।' এই বলে লতিফকে উদ্ধত জনগণের হাত থেকে রক্ষা করলো। অপরদিকে মামুদও এক গোয়ালঘরে লুকিয়ে থেকে রাত কাটালো। সহজ সরল ভাষায় গল্পটির পেছনে লুকিয়ে আছে চিরাচরিত সেই কুসংস্কার।

'রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোক তাহাকে ভয় করিত।' 'রামের সুমতি' নামে লেখকের গল্পটি এভাবে শুরু হয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্রামের মা-বাবা মরা এক দুরন্ত কিশোর রাম। মা-বাবা না থাকলেও রামের মায়ের মতো এক বৌদিদি আছেন যিনি রামকে সবসময় নিজের ছেলের মতো স্নেহ-মমতা দিয়ে আগলে রাখেন। রামও বৌদিদিকে নিজের মা-ই মনে করেন। কিন্তু বিপত্তিটা বাধে যখন নারায়ণীর মা এসে হাজির হয় দুজনের মাঝখানে। রাম যেটা পছন্দ করে না নারায়ণীর মা দিগম্বরী দেবী ঠিক তার উল্টোটা করে বসে। এভাবে চলতে চলতে একদিন দিগম্বরী দেবী রামের শখ করে পোষা মাছ কার্ত্তিক-গণেশ দুটিকে পুকুর থেকে ধরে রান্না করে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ খাওয়ালো। নিজের শখের মাছকে এভাবে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে দেখে খুবই মর্মাহত হয়ে যায় রাম। এরই মধ্যে একসময় গ্রামের এক জমিদারের ছেলেকে তুচ্ছ বিষয়ে রাম প্রহার করে। রামের এমন কান্ডে বিরক্ত হয়ে রামের বড় ভাই শ্যামলাল তাকে সবকিছু ভাগবাটোয়ারা করে দিয়ে আলাদা করে দেয়।

কিন্তু ছোট্ট রাম এর কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। যখন নিজের মায়ের মতো বৌদিদিও তার সঙ্গে কথা বলে না তখন রাম তাদের ছেড়ে চলে যেতে চায় অজানা কোনো এক জায়গায়। 'নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজি আছে রে? কোথায় সে? ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ি আছে যে! যা ভোলা শীগ্গিরি ডেকে আন্-বল্, আমি ডাকছি। ভোলা ছুটিয়া গেল নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরেই রাম একটি ছোট পুঁটলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন।'

সবকিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কিন্তু মা-ছেলের সেই সুখ নারায়ণীর মা দিগম্বরী দেবীর কাছে বিষের মতো হয়ে উঠল। একসময় ওসব সহ্য করতে না পেরে দিগম্বরী দেবী নিজেই সেখান থেকে প্রস্থান করে। কিন্তু তাতে আগের মতো কেউ বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। কারণ সবাই জানে পরিবারের এই অশান্তির মূলে একমাত্র দিগম্বরী দেবীরই হাত রয়েছে। অবশেষে দিগম্বরী দেবী চলে যাওয়ার পর সব সুখ আগের মতো ফিরে আসে। আর রামও তখন দস্যিপনা ছেড়ে দিয়ে সুবোধ ছেলে হয়ে উঠে। লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন গ্রামের এক সহজ-সরল বালকের দুরন্তপনা। অপরদিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অনাথ এক বালকের প্রতি মাতৃতুল্য বৌদিদির স্নেহমাখা ভালোবাসা। যে বন্ধন শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও অটুট থাকে।

দেবী চলে যাওয়ার পর সব সুখ আগের মতো ফিরে আসে। আর রামও তখন দস্যিপনা ছেড়ে দিয়ে সুবোধ ছেলে হয়ে উঠে। লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন গ্রামের এক সহজ-সরল বালকের দুরন্তপনা। অপরদিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অনাথ এক বালকের প্রতি মাতৃতুল্য বৌদিদির স্নেহমাখা ভালোবাসা। যে বন্ধন শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও অটুট থাকে।

'পাগলের মত ছুটে বাহিরে গিয়ে চাকরদের যাকে সমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, - হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন্।' আর ওই বজ্জাতটা হলো 'লালু' গল্পের দুরন্ত বালক লালু নিজেই। 'লালু' গল্পের সারমর্ম হলো একদিন তাদের তিনতলা বাড়িতে তার মা নন্দরাণীর গুরুদেব আসে। গুরুদেব রাত্রিকালে যে খাটে ঘুমাতে যাবেন ওই খাটের ওপর একটা বড় বরফের টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে বিশেষ কায়দায় বেঁধে রাখলেন লালু। যখন রাত্রে গুরুদেব ঘুমাতে গেলেন তখন ওই বরফ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি ঝরছে। গরুদেব প্রথমে মনে করলেন হয়তো যে জায়গায় খাট আছে ওই জায়গার ছাদ ফুটো।কিন্তু বেশ কয়েকবার আস্ত খাটটিকে এদিক-ওদিক নড়ানোর পরও যখন অনবরত পানি ঝরেই যাচ্ছে তখন গুরুদেব মনে করলেন বাড়ির পুরো ছাদটিই ফুটো। তখন ওনি ওই খাটে না ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে থাকলেন মশার কামড় খেয়ে। পরদিন নন্দরাণী আবিষ্কার করলেন লালুর এহেন শয়তানি বুদ্ধির কর্মকাণ্ড। অবশ্য লালু তখন কিন্তু মারের ভয়ে মাসির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই গল্পটিতে এক দুরন্ত বালকের দস্যিপনা ও গুরুদেবের নির্ব্বুদ্ধিতা ফুটে উঠে বলে মনে।

'ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারি মুশকিল হলো-হাওয়া পড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না। নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।' শরৎচন্দ্রের আর একটি গল্প 'কলকাতার নতুন-দা'। এই গল্পে একজন ফুলবাবু যাকে কিনা সবাই নতুন-দা বলে ডাকতেন তিনি এসে হাজির হলেন এক গ্রামে কোনো এক শীতের সন্ধ্যায়। তারপর দুইজন সমবয়সী বালক শ্রীকান্ত আর ইন্দ্র এলএ পাশ করা সে নতুন-দাকে সাথে নিয়ে জ্যোস্না মাখা রাতে গঙ্গা নদীর মধ্য দিয়ে নৌকায় করে থিয়েটারে সিনেমা দেখতে বের হয়। রাত এগারোটার সময় থিয়েটারে পৌঁছানোর আগেই নতুন-দার ক্ষুধা নিবারণের জন্য যখন একটা গ্রামের পাশে নৌকা ভিড়িয়ে নতুন-দাকে একা রেখে তারা উভয়ই খাবারের সন্ধানে বের হয় তখনই ঘটে এক মজার কাণ্ড।

তীরের বজ্জাত কুকুরের দল নাদুসনুদুস শহুরে বাবুকে পেয়ে একেবারে ঠান্ডা জলে নামিয়ে ছাড়ে। কিন্তু একসময় শ্রীকান্ত আর ইন্দ্র এসে নতুন-দাকে উদ্ধার করে। যে নতুন-দা সন্ধ্যাবেলায় যাওয়ার সময় গ্রামের মানুষ, পোশাক সবকিছুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিল, ঠান্ডায় টকটক করে কাঁপতে থাকা সেই নতুন-দা আসার সময় শ্রীকান্তের গায়ে দেওয়া র্যাপারটি নিজেই গায়ে দিয়ে সে যাত্রায় রক্ষা পেল। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই চলার পথে কোনো জিনিসকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ভালো নয়। যে জিনিসকে আমরা অবহেলা করছি হয়তো ওই জিনিসই বিপদের সময় আমাদের একমাত্র অবলম্বন হতে পারে।

'হরিচরণ' শিরোনামে গল্পে লেখক এক আনুগত্য এগারো-বারো বছর বালক ভৃত্যের কথা বলেছেন যে নিজের কাজের মাধ্যমে বাড়ির মালিককে সন্তুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু একদিন জ্বরের কারণে মালিকের ঘুমানোর বন্দোবস্ত করতে না পারায় মালিকের দ্বারাই প্রহারিত হয়ে দশদিন পর চিরকালের মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেন বালক ভৃত্য হরিচরণ।'বিন্দুর ছেলে' গল্পটিতে দুই জা'র হাসি-ঠাট্টা-ঝগড়া, মান-অভিমানের মাধ্যমে অমূল্য নামক এক শিশুকে উপজীব্য করে লেখক তুলে এনেছেন তাদের চমৎকার এক আত্মিক বন্ধন। অমূল্য ছোট জা বিন্দুর ছেলে না হলেও

বিন্দু নিজের ছেলের মতোই অমূল্যকে ভালোবাসতেন। কিন্তু একদিন বড় জা অন্নপূর্ণার সাথে অভিমান করে দুজন দু'বাড়িতে গিয়ে উঠলেও একদিন ঠিকই সবাই একজায়গায় এসে মিলিত হয়।

শরৎচন্দ্রের আরও একটি চমকপ্রদ গল্প 'মেজদিদি'।এখানেও লেখক চৌদ্দ বছরের এক বালক কেষ্টকে উপজীব্য করে তুলে এনেছেন ভালোবাসার বন্ধন। বাবা-মা হারা কেষ্ট যখন সৎ বোনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয় তখন তা সৎ বোন সহ্য করতে না পারলেও সৎ বোনের জা কেষ্টকে নিজের ছেলের মতোই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়। কেষ্ট তখন সৎ বোনের জা'কে মেজদিদি বলে ডাকতে শুরু করে। এভাবে শুরু হওয়া বন্ধন যা গল্পের শেষেও লেখক অটুট রেখেছেন এই বলে, 'কেষ্ট তোর মেজদিকে তুই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই; শপথ করছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ছেলেধরা' গল্পের বইয়ের প্রতিটি গল্পে কোনো না কোনোভাবে বালক কিংবা শিশু-কিশোরদের উপজীব্য করে গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কখনো তিনি দুরন্ত বালকের দস্যিপনায় এঁকে দিয়েছেন বিয়োগান্ত কোনো ঘটনা। আবার কখনো তিনি হাসি-ঠাট্টায় তুলে এনেছেন সুবোধ বালকের সাহসীপনা। এভাবে প্রতিটা গল্প শেষ হয়েও যেন শেষ হয়ে উঠে না। ছোট থেকে বড় না ছোট যারাই এ গল্পগুলো পড়বে সবার চোখে নিশ্চিত পানি চলে আসবে।

উপসংহার:-

শরৎচন্দ্রের সমাজভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো নীতি সৌন্দর্য-বিবেকের প্রশ্নে আলোড়িত নয়। এই সমাজ বিশেষভাবে পল্লীসমাজ। তার নিজের ভাষায় : "দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতুহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি এবং তাদের বহু দুঃখ বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি" ('স্বদেশ ও সাহিত্য' পৃষ্ঠা)— আর সেই দুঃখ-দৈন্য প্রকাশের কাজে তার গল্প-উপন্যাসে দেখা গেছে "একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা, জাতিভেদ ও কন্যাদায়ের সমস্যা, অকাল বৈধ্যবের সমস্যা, দাম্পত্য অসমন্বয়ের সমস্যা, পদস্খলিতা নারীর সমস্যা" (দ্রষ্টব্য : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র : সাহিত্যে ও কালচিন্তায়', 'উত্তরসূরী' ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র সাহিত্যে অতৃপ্ত এক বৃহৎ পাঠক সমাজ শহরে বা শহরান্ত পল্লীতে সমাজসত্যের এই সাধারণ বাস্তব রূপের পরিচয় পেয়ে হল অভিভূত। বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠল বঞ্চিত প্রেমের জীবনবেদ, হয়ে উঠল শোষিত মানুষের রক্তাক্ত আলেখ্য। বাংলার পল্লীসমাজের সংকীর্ণ প্রথাপোষিত জীবনযাত্রার অন্তরালে নির্বাসিত প্রেম কিভাবে গুমরে মরে, সংস্কার ও সতীত্বের দুমুখো অস্ত্রের আঘাতে এই সমাজে কিভাবে নারীমন হত্যা করা হয়, ন্যায়-বিধানের নামে মানুষকে স্বর্গে পাঠানোর চিন্তায় উচ্চবর্ণের সমাজপতিরা যে কি প্রবল অত্যাচার করে, শরৎসাহিত্য তার জীবন্ত দলিল।

শরৎসাহিত্য প্রধানত নারী-মনের ভাষ্য, এ সত্য বহুজন স্বীকৃত। নারীর মূল্য, শরীর নারীত্ব ও সামাজিক মর্যাদা তার গল্প-উপন্যাসে সর্বাধিক পরিমাণে প্রতিফলিত। সেইদিক থেকে নারী-মন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এখানে তার অন্তর্জগতের পরিবর্তন হয়েছে দু'দিক থেকে— একদিকে সমাজপতিদের নীতি নিয়মের প্রত্যক্ষ আঘাতে, অন্যদিকে হিন্দুনারীর অন্তর্জাত সংস্কারের অভিঘাতে। তাই তার মন সদাই দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। সমাজ-বিদ্রোহিণী হয়েও সে সমাজ-অনুগ। সেইজন্য দেখা যায়, 'পল্লীসমাজে' সমাজপতি বেণী ঘোষালদের ভয়ে বিধবা রমা যেমন তার প্রেম

প্রকাশে কুণ্ঠিতা, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-বিধানের উদ্যত দণ্ড না থাকলেও নিছক সংস্কারের বাধায় রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সম্মতি সত্ত্বেও বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। আর সেইজন্য নারীচিত্তের সচেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্বে ও জটিলতায় শরৎসাহিত্য হয়েছে আকর্ষণীয়।

গ্রন্থপঞ্জী:-

১) গল্পসমগ্র – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২) বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ – সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়

৩) বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল

Citation: মাইতি, ন. **(২০২৪)** **"**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমকালীন বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি" *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-4 May-2024.